দুইঃ উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার পটভূমি এবং উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ধারা ঃ

উত্তরবঙ্গের নাট্য চর্চার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতাব্দী থেকেই সম্ভবত: এই নাট্যধারার সূত্রপাত হয়েছিল, কিংবা এই ধারার সূচনা এর আগে হওয়াও অসম্ভব নয়। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আগে অর্থাৎ প্রাক্-তুর্কী আক্রমণের আগে উত্তরবঙ্গ ছিল প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার ক্ষেত্র। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ মঠ ও বিহার ছিল। এই সব মঠ ও বিহার গুলিতে যে একধরণের নাটক অভিনীত হতো, যেগুলিকে আমরা চর্যাপদে উল্লিখিত 'বুদ্ধ নাটক' বলতে পারি, তা সহজেই অনুমেয়। বৌদ্ধরা নাট্যাভিনয়কে ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং উত্তরবঙ্গের মঠ, বিহার গুলিতেও এই ধরণের নাটকের অভিনয় হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর তুর্কী আক্রমণের ফলে এই সব মঠ ও বিহারগুলি বিনষ্ট হয়। সেই সঙ্গে সম্ভবত: বৌদ্ধনাটক চর্চার ধারাটিও অবলুপ্ত হয়।

খ্রী: দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার রাজধানী ছিল 'লক্ষ্মণাবতী' অর্থাৎ 'গৌড়'। লক্ষ্মণ সেন অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি নাট্যরসিকও ছিলেন। তাঁর সভাকবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' নাট্যলক্ষণাক্রান্ত গীতিনাট্যশ্রেণীর রচনা। 'গীতগোবিন্দ' মূলত: সমকালীন প্রচলিত নাটগীতের আদর্শেই রচিত। জয়দেব যে এতদঞ্চলে প্রচলিত নাটগীতের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। 'সেক শুভোদয়া'য় উল্লিখিত গঙ্গনটের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে সমসসাময়িক কালে উত্তরবঙ্গে ব্যাপক ভাবে নাট্যচর্চা হতো। এতদঞ্চলে নাট্যচর্চার একটি ঐতিহ্য না থাকলে গঙ্গনটের মতো এমন তদ্‌ভাবাত্মক অভিনেতার অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না।

লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী তুর্কী আক্রমণোত্তর অন্ধকারময় কাল। এই সময়কালীন বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি চর্চার কোনো ইতিহাসই পাওয়া যায় না। ১৩৪০ খ্রী: সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সিংহাসন আরোহণ করার পর বাংলাদেশে সুশাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এলেও দীর্ঘদিনের অরাজকতা ও অত্যাচারের বিভীষিকা বাঙালীর মন থেকে তখনও মুছে যায় নি। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আমরা আবার শিল্প সংস্কৃতি চর্চার কিছু কিছু নিদর্শন পেতে থাকি — যেমন এই সময়ে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন', মানিক দত্তের 'চন্ডীমঙ্গল', কানা হরিদত্তের 'মনসামঙ্গল', ময়ূর ভট্টের 'ধর্মমঙ্গল' প্রভৃতি সাহিত্য চর্চার সূচনা হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গ শিক্ষা দীক্ষায় যে যথেষ্ট উন্নত ছিল, তার একটি উল্লেখ পাই কৃত্তিবাস ওঝা'র আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন কৈশোরে তিনি বড় গঙ্গা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে বিদ্যাচর্চা করতে এসেছিলেন এবং বেশ কয়েক বছর শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে যান। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা অনুমান করতে পারি, যে অঞ্চল শিক্ষা দীক্ষায় এতটা উন্নত ছিল, সেখানে আমোদ প্রমোদের আয়োজনও ছিল। আমোদ প্রমোদের মাধ্যমগুলির মধ্যে বাঙ্গালী জাতির কাছে প্রধান ছিল নাট্যাভিনয় — কারণ আমরা জানি বাঙালী নাট্যামোদী জাতি। সুতরাং যেখানে বিদ্যাচর্চা, সেখানে অভিনয় চর্চাও যে হতো, তা অনুমান করা খুবই কষ্ট কল্পিত নয়।

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের রাজসভায় (১৫৫৪ - ১৫৮৮ খ্রী:) নাট্যচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণ পাই। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ দুজনেই নাট্যামোদী ছিলেন। নরনারায়ণের রাজসভায় নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হতো বলে কথিত আছে। তাছাড়া রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজের নিজস্ব একটি নাট্যদল ছিল। অসমীয়া নাট্যকার শঙ্কর দেবের 'রামবিজয়' নাটকটি শুক্লধ্বজের নাট্যদলের মাধ্যমে প্রথম অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়।[১] মহারাজ নরনারায়ণের রাজসভায় নাট্যচর্চার এই বিবরণ টি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি নরনারায়ণের পৃষ্ঠ পোষকতায় এমন একটি নাট্যদলের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে এতদঞ্চলের জনসাধারণ যথেষ্ট নাট্যানুরাগী ছিলেন। তাছাড়া, এই অঞ্চলে যে নাট্যচর্চার একটি ধারাবাহিক ঐতিহ্য ছিল, তাও আমরা সহজেই অনুমান করতেপারি। একমাত্র 'রামবিজয়' ছাড়া এই নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনীত অন্য কোন নাটকের নামই জানা যায়না। এর কারণ অনুমান করা শক্ত নয়।

আমরা দেখেছি প্রাচিন ও মধ্যযুগে বাংলা দেশে যে নাট্যচর্চা হতো, তার কোনটিরই নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

সাগর নন্দী'র 'নাটক লক্ষণ রত্ন কোষ' এ যে নাটকগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা সেগুলির নামটুকুই মাত্র পেয়েছি — আজ পর্য্যন্ত তাঁর একটি নাটকেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এর কারণ সম্ভবত: এই যে তখন নাটকগুলি খসড়া আকারে লিখিত হতো এবং নাট্যকার নিজেই তার পাণ্ডুলিপি রক্ষা করতেন — অল্পকালের মধ্যেই বাংলা দেশের আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে পাণ্ডুলিপিগুলি বিনষ্ট হয়ে যেত। ষোড়শ শতাব্দীর পর এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গে নাট্যচর্চার আর কোন গ্রহণযোগ্য বিবরণ বা নিদর্শন পাওয়া যায়না।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মধ্য উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ আড়াইশ' বছর উত্তরবঙ্গের মানুষ যে নাট্যচর্চায় বিরত থেকেছে বা কোনো ভাবে নাট্যরস আস্বাদনে বঞ্চিত হয়েছে — একথা মনে হয়না। খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই দক্ষিণ বঙ্গের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে যে যাত্রাগানের উদ্ভব ও প্রসার হয়েছিল, সম্ভবত: তার ঢেউ এসে উত্তরবঙ্গে লাগেনি। ফলে এখানে পরিশীলিত নাটগীত বা যাত্রার বিকাশ হয়নি। তবে এখানে যে নাটগীত বা লোকনাট্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ছিল — তাতে সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লোকনাট্যের প্রচলন অনেক কাল আগেই ছিল। এখানে এই লোকনাট্যগুলির কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে — যেমন কোচবিহারের কুষাণ, হুদুম দেও, মদনকাম নৃত্য, বিষহরির গান, জলপাইগুড়ির পালাটিয়া, দিনাজপুরের খন, মালদহের গম্ভীরা, আলকাপ প্রভৃতি।

এই লোকনাট্য বা নাটগীতগুলির অভিনয় রীতি সবসময় একরকম থাকতো না। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে এই নাটগীতগুলি অভিনীত হতো। সাধারণ মানুষ এই গুলি দেখেই তাদের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করতো। একথা সত্য যে বাংলাদেশ 'বারোমাসে তেরো পার্বণের' দেশ। বিভিন্ন পার্বণ উপলক্ষে এখানে গান গাওয়া হতো এবং গানের সঙ্গে যুক্ত থাকতো নৃত্য। সুতরাং তথাকথিত আসর-নিবদ্ধ অভিনয় কলা ছাড়াও নৃত্যগীতাত্মক নাচ-গানের মধ্যে যে নাট্যরসের আস্বাদ উপভোগ করা সম্ভব — সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরবঙ্গের জনসাধারণ, হয়তো ব্যাপক অর্থে সমগ্র বাংলাদেশেরই জনসাধারণ প্রচলিত নাটগীত গুলির মধ্যে তার বাস্তব প্রমাণ রেখেছেন। এখানে উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে একধরণের গান প্রচলিত ছিল, যার নাম 'ধেমালী' বা 'ধামালী'। রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক এই লৌকিক গানগুলিও সম্ভবত: নৃত্যগীতের মাধ্যমেই পরিবেশিত হতো। এই সব লোকনাট্যের রূপ রীতি অভিনয়াদির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

কোচবিহারে লোকনাট্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত 'কুষাণ'। কুষাণ-দলে মোট ১৪/১৫ জন লোকশিল্পী থাকে। এই শিল্পীদের মধ্যে একজন মূল গায়ন, একজন দোহারী এবং বেশ কিছু নর্তকী সাজে সজ্জিত বালক (চ্যাংড়া) নৃত্য, গীত এবং পালার রসদ্যোতক পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ সক্রিয় থাকে। মূল গায়ন 'গীতাল' বা 'গীদাল' হিসাবে কোচবিহারের লোক সমাজে পরিচিত এবং লোকনাট্যের বিভিন্ন দল বিভিন্ন গীদালের নামেই প্রচারিত থাকে। 'গীদাল'ই লোকনাট্যদলের প্রাণ, তার সহকারী 'দোহারী'। গীদালের হাতে বেণা (বীণা) এবং চামর থাকে। দোহারী গীদালের পরিবেশিত গীতের ধুয়া দেয় এবং গীদালের নাট এবং গীতের বিষয়বস্তুকে অঙ্গ ভঙ্গির মাধ্যমে হাস্যরসাত্মক করে সহজ ভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয়। দোহারী আসলে গীদালের সঙ্গে দর্শক সাধারণের সংযোগ ঘটিয়ে দেয় এবং এভাবে 'কুষাণ' লোকপালার রসদ্যোতনের সাধারনীকরণ ঘটায়। গীদাল এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক — পালার তথ্য পরিবেশক, দোহারী সেক্ষেত্রে পালার রসঘন মুহুর্তকে প্রায়োগিক করতে দক্ষ লোক শিল্পী, নর্তকীর দল সেক্ষেত্রে আবহশিল্পী।

কুষাণ লোকনাট্যের পর কোচবিহারের উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য 'হুদুম দেও নৃত্য'। উত্তরবঙ্গের নারী সমাজে, বিশেষ করে কোচবিহারের রাজবংশী নারীদের মধ্যে এটি প্রচলিত। দেশে অনাবৃষ্টি হলে বৃষ্টির কামনায় রাজবংশী রমণীরা দলবদ্ধভাবে এই আদি রসাত্মক নৃত্যগীত অনুষ্ঠান করে। এই নৃত্যগীতের মধ্যে হল কর্ষণ সূচক একটি অভিনয় ক্রীড়াও বর্তমান থাকে। এই অনুষ্ঠানে রাজবংশী রমণীরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে এলোচুলে আদিরসাত্মক ভাব নিয়ে বৃষ্টির দেবতা (বরুণ) কে আপাত অশ্লীল গান ও নাচের মাধ্যমে তিরস্কার করে। দুটি রমণী হাঁটু গেড়ে বসে গরু বা বলদের অনুকরণে ঘাড়ে জোয়াল নিয়ে একটি লাঙ্গল টানে। লাঙ্গলের ফলায় যতটুকু মাটি কর্ষিত হয়, তাতে কয়েকটি ধান ও ধানের চারা বপন বা পোঁতার অভিনয় করে। এভাবেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এই নৃত্যগীত পুরুষের পক্ষে দর্শন নিষিদ্ধ ছিল।

'মদন কাম পূজা' কোচবিহারে প্রচলিত অপর আর একটি লোকনৃত্য। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলায় বৈশাখ মাসে মদন চতুর্দশী উপলক্ষে রাজবংশী যুবকদের মাধ্যমে এই লোকনৃত্যটি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে দুটি লম্বা বাঁশ মদন ও রতির প্রতীক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। তারপর উক্ত বাঁশ দুটি লাল শালু কাপড় দিয়ে জড়ানো হয়।

প্রতিটি বাঁশের মাথায় চামর বাঁধা হয় । তারপর মূল অনুষ্ঠান অর্থাৎ 'বাঁশ জাগাও' পূজার আয়োজন করা হয় । এই অনুষ্ঠানে রাজবংশী যুবকদের মধ্যে মেয়েলী ঢঙের শাড়ী কাপড় পরার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । আবার কেউ কেউ রঙীন পোষাকে সজ্জিত হয় এবং চামর হাতে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে মাগন তোলে । এই উপলক্ষে গৃহস্থ বাড়ীতে তারা আদিরসাত্মক নাচ ও গান করে ।

চড়ক পূজা উপলক্ষে শিব-পার্বতীর নাচের একটি প্রাচীন লোকায়ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে । এই চড়ক পূজা উপলক্ষে উত্তর বঙ্গের রাজবংশীগণ মহাদেবের পূজা করেন । শিব পার্বতী এবং যোগিনীর সাজ-সজ্জা নিয়ে রাজবংশী ভক্তগণ ঢাক ও কাঁসির তালে তালে নৃত্যগীত করে থাকেন ।

'মেচেনী খেলা' বা 'ভেদেই খেলি নাচ' উত্তর বঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত একটি লোকনৃত্য । উক্ত জেলার রাজবংশী সমাজে বৈশাখ মাসে তিস্তাবুড়ির পূজা উপলক্ষে মহিলারা যে গীত-নৃত্য করে, তারই নাম মেচেনী খেলা'। নামভূমিকায় এটি খেলা হলেও আসলে এটি পূজা-অনুষ্ঠান । 'মেচেনী' নামটি সম্ভবত: এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী 'মেচ' সম্প্রদায়ের প্রভাব জাত । এই অনুষ্ঠানে একটি ডালার মধ্যে লাল শালু দিয়ে ঢাকা তিস্তাবুড়ির ঘট রাখা হয় । ডালাটি মেচ-রমণীরা মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ি থেকে বাড়ি যায় । প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে ডালাটি একটি পিঁড়িতে তারা রাখে এবং তার উপর একটি ছাতা ঢাকনা হিসাবে ব্যবহার করে । তারপর ডালায় রাখা সেই তিস্তাবুড়ির ঘটকে কেন্দ্র করে মেচ রমণীরা নাচে ও গান করে । উত্তর বঙ্গের এই 'মেচেনী খেলা'র সঙ্গে পুরুলিয়ার পশ্চিম অঞ্চলের আদিবাসী সমাজে প্রচলিত 'জাওয়া' নৃত্যের একটি সুযোগ্য-সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ।

পৌষমাসে একটি বিশেষ লোকায়ত নৃত্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে জলপাইগুড়ি জেলার প্রাচীন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে । এর নাম ধামগান ও নাচ । এটিও মূলত: ধর্মসংস্কারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । এই ধর্মীয় সংস্কার রাজবংশী সমাজের কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । ধানকাটার মরসুম শেষে গ্রামে প্রাচীন কোন ধর্মস্থানে এই পূজার আয়োজন হয় । এই উপলক্ষে যে গান ও নাচ হয়, তাই 'ধামগান ও নাচ' নামে পরিচিত । জলপাইগুড়ির 'পালাটিয়া' লোকনাটক আসলে এই ধামগানেরই একটি অন্যতম দিক । যদিও সব ধামগানই পালাটিয়া নয়, তবে পালাটিয়া মাত্রেই ধামগান হতে পারে ।

দার্জিলিং জেলার দক্ষিণাংশে সমতল তরাই অঞ্চলে রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন পালাগানে রাধাকৃষ্ণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক অন্যতম একটি শাখা 'নটুয়া' পালা । 'নটুয়া' শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'নট+ উয়া' — নট বা নৃত্য সম্পর্কিত । নাচ গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পালাগানই তরাই অঞ্চলে রাজবংশী সমাজের মধ্যে 'নটুয়া' পালা হিসেবে চিহ্নিত । এই 'নটুয়া' পালায় কৃষ্ণের ভূমিকা চেয়ে রাধার ভূমিকা বেশি। এর দুটি পর্ব বা ভাগ বর্তমান — 'কুঞ্জলীলা' এবং 'বিয়োগ' বা 'বিরক' । ১০/১২ জন দোহার নিয়ে 'নটুয়া' নাট পালাটি অনুষ্ঠিত হয় । একজন মূল গীদাল, দুজন ছুকরী, দুজন বতেয়া মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন । বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ছোট আকারের ঢোলক বা মৃদঙ্গ এবং একজোড়া করতাল ব্যবহৃত হয় । 'নটুয়া' নাটপালা ছাড়া উত্তরবঙ্গের আর অন্য কোন নাট পালায় মৃদঙ্গ ব্যবহারের রীতি নেই ।[৩]

এই নাটপালার পরিকাঠামো উত্তর বঙ্গের অন্যান্য নাটপালার মতোই । মূল গীদাল প্রথমে গান শুরু করে । গীদালের প্রতিটি গানের পদের শেষে বতেয়া ধুয়া ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্ন ছড়ার আকারে বলে । এই ছড়া গুলিকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা 'ফ্যাকিরি' বলে থাকে । বস্তুত: এই 'ফ্যাকিরি'র মাধ্যমে উক্ত 'নটুয়া' নাটপালায় হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা করা হয় । বতেয়া'র ভূমিকা এক্ষেত্রে 'Dramatic relief' জাতীয় হলেও হাস্যরসের মাধ্যমে বতেয়া দর্শক সাধারণের হৃদয়ে রাধার হৃদয়-'বিরক' বা বিরহের মর্মার্থটি তুলে ধরে ।

'নটুয়া' দলের কুশীলবদের সাজ সজ্জা বিচিত্র ধরণের । নটুয়া দলের ছুকরী শাড়ির পরিবর্তে ঘাগরা এবং ওড়না ব্যবহার করে । বতেয়া রঙচঙে জামা এবং মাথায় একটি পাগড়ী পরে । বতেয়ার মুখে কালি-রঙ মাখানো থাকে এবং বতেয়ার পায়ে এবং কোমরে বাঁধা থাকে ঘুঙুর ।

'নটুয়া' নাটপালাটি নৃত্য প্রধান । বতেয়া এবং ছুকরী একই সঙ্গে নৃত্য করে । নৃত্যের তাল নির্ভর করে মৃদঙ্গ বাদকের কলা-কৌশলের উপর । নৃত্যকে এখানে 'তাল' দেওয়া বলে । 'নটুয়া' পালার প্রাথমিক পর্বটি হলো 'তাল দেওয়া' । দ্বিতীয় পর্ব বন্দনা — দিক্ বন্দনা, দেব-দেবীর বন্দনা, সাগর বন্দনা প্রভৃতি । সবশেষে দশমুনির চরণ এবং দর্শকদের চরণ বন্দনা করে এই পালার মূল পর্ব অর্থাৎ মূল পালাটি শুরু হয় ।

অবিভক্ত দিনাজ পুরের (সাদি পুরের) 'রাম বনবাস' পালায় গাইনের (হাকারের) বন্দনা গানে প্রকৃত পক্ষে

লোকনাট্যের যথার্থ চরিত্রটি ফুটে ওঠে । এই অঞ্চলের ' গায়ের গারাম ' এবং দশ ভাইর চরণ ' লোকনাট্যের আঙ্গিক ধর্মকে ধ্রুপদী মাত্রা দিয়েছে । এছাড়াও এই অঞ্চলের ' হালুয়া-হালুয়ানি ' ব্রতকেন্দ্রিক নাটপালার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । ' বন্ধু পুছা ' বা ' বন্ধু আলা ' অপর আর একটি নাটপালা — যেখানে মানব প্রীতির একটি নিশ্চিত ভাবধারা বর্তমান । ' ঢাকোসরী ' বা ' ঢাকোশোরী ' নাটপালাটিও রশোনপুর (দাইবুড়ি) অঞ্চলে সুপ্রচলিত । এই নাটপালার চরিত্রগুলি বাঘো , ঢাকো , ভেদু মন্ডল , ডমন , বাংকা , জগেন্দর , গবিন , জমাদার , পুলিশ প্রভৃতি ।

এই জেলার কুশমন্ডী থানার শা পাড়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলে ' সুমিতা যোগী ' নামে একটি নাটপালার অস্তিত্ব বর্তমান । এটি আসলে ' খন ' নাটপালার অন্তর্গত । সুপ্রাচীনকালথেকে সাঁওতাল , ওঁরাও , মুরিয়া , বইগা , এমনকি মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত সমাজে এর প্রচলন ঘটে ।

' মায়া বন্ধকী ' এই জেলার অন্য আর একটি প্রচলিত নাটপালা। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কৃষ্ণবাটি গ্রামে এবং আশে পাশের অনেক গ্রামে ' মায়া ' অর্থাৎ কন্যাকে বন্ধক বা দাসী হিসেবে বিক্রয় করার রীতি বর্তমান । এই নাটপালার চরিত্রগুলি বিচিত্র নামের , যেমন -- রঙ্গিয়া , ঢালা , ঘেরু ঘেরু , কেরকেরু , মসকু , নসকু , দেউনিয়ানি শোলো, ঠোঙ্গালো প্রভৃতি ।[৪] লোকনাট্য-সমীক্ষক দুলাল চৌধুরীর মতে -- " 'মায়া বন্ধক ' অন্যান্য লোকনাট্যের তুলনায় একটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ লোকনাট্য ।"[৫]

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার (অবিভক্ত) তাম্বুলপুর অঞ্চলে ' নয়ান শোরী ' একটি জনপ্রিয় নাটপালা । এটি 'খন' নাটপালার বিশেষ অঙ্গ । এই নাটপালাটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য ।[৬]

এই জেলার আর একটি বিশিষ্ট নাটপালা ' মোচ্ছব ' । পালাটি পশ্চিম দিনাজ পুরের দেশি , পলি সমাজে খুবই জনপ্রিয় । এটি সমীকৃত বৈষ্ণব গোঁসাই বাদের সমুজ্জ্বল নিদর্শন । এরকম আর একটি নাটপালা ' বর্মোশোরী ' (ব্রহ্মাশ্বরী) । পশ্চিম দিনাজ পুরের টুঙ্গুল , বিলপাড়া , গৌরী গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এই পালার প্রচলন রয়েছে ।

বর্তমান উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর অঞ্চলে বাঁশবাড়ি গ্রাম থেকে সংগৃহীত হয়েছে অপর আর একটি নাটপালা । এর নাম ' সংসার গোষ্ঠীর ' ।[৭] এটি আসলে ' রঙ পাচালি ' গানের অন্তর্ভুক্ত । পালাটিয়া লোকনাট্যের 'রঙ পাচালি ' আর ' মান পাচালি' জলপাইগুড়ি জেলায় বিশেষভাবে প্রচলিত । জমিদার , জিলাদার , দরিদ্র মানুষ , ডাক্তার, ঢুলিদার , সাত চোর , গ্রামবাসী ইত্যাদি চরিত্র এখানে চিত্রিত ।

মুর্শিদাবাদের লোকনৃত্য গাজন উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ' মড়া খেলা'র মতো উত্তরবঙ্গের মালদহে 'গম্ভীরা'র অন্তর্গত একটি লোকায়ত নৃত্য ' গৃধিনী বিশাল নৃত্য ' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । এই নৃত্যে একটি স্থানকে শ্মশান কল্পনা করে নিয়ে তার মাঝে একটি মড়ার খুলি রেখে নর্তকেরা অঙ্গ- ভঙ্গি যোগে নৃত্য করে । এই নর্তকেরা শব ভক্ষণ রত গৃধিনীরই অনুকরণ করে থাকে । ঢাকের তালে তালে গৃধিনী'র ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে চক্রাকারে উড্ডীয়মান দৃশ্যের সঙ্গে দ্রুতগতিতে এই নৃত্য চলে ।

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মালদহে ' গম্ভীরা' র অনুষ্ঠান প্রচলিত । এই অনুষ্ঠানটি প্রথামাফিক চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় দিন থেকে চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত প্রতিটি দিনের আনুষ্ঠানিক বিশেষ নাম যথাক্রমে ছোট তামাসা , বড় তামাসা ও আহারা , বোলবাই বা বোলাই । ' তামাসা ' কথাটি রঙ্গ রসিকতা-ব্যঞ্জক । ' ছোট তামাসা ' দ্বিতীয় দিনের গম্ভীরা'র আনুষ্ঠানিক নাম । এই দিন উৎসবমুখর রাতে নাচগান ও মুখোস নৃত্যের অনুষ্ঠান ঘটে । পৌরাণিক ও লোকায়ত বিষয়াশ্রিত নাচ-গান ছোট তামাসা'র বিষয়বস্তু । তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় গম্ভীরা'র ' বড় তামাসা ' অনুষ্ঠানটি । এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ মুখোসনৃত্য । এই দিন দুপুরে ভক্তদের এক শোভাযাত্রা বার হয় । ভক্তগণ গম্ভীরা'র মন্ডপ থেকে ঢাক বাজিয়ে বিচিত্র বর্ণের বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে অর্থাৎ ভূত , পেত্নী , বাজিকর , বাজিকর-পত্নী প্রভৃতি বেশে সজ্জিত হয়ে মন্ডপ থেকে মন্ডপে পরিক্রমণ করে । সন্ধায় হনুমানের নাচ । মধ্য রাত্রে ভূত-প্রেত, রাম-লক্ষ্মণ , শিব-দুর্গা, কালী , ঘোড়া নৃত্য ; বাশুলী নৃত্য প্রভৃতি ছোট ছোট মুখোস নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় । চতুর্থ দিনের ভোরে ' মাশান নাচ' দিয়ে ' বোলবাই ' বা ' বোলাই ' এর অনুষ্ঠান শুরু হয় । ' মাশান নাচ ' একটি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির বিভীষিকাময় নৃত্য । এই নাচের পর গম্ভীরা'র মূল অনুষ্ঠান হর-পার্বতীর পূজানুষ্ঠান ঘটে । চতুর্থদিনের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ গম্ভীরা'র সঙ । এই সঙের গান যাঁরা বাঁধেন , তাঁদের বলা হয় ' *খলিফা* ' । এই শেষ দিনের উৎসবে ' শিবের চাষ ' বলে একটি অভিনয় হয় । এতে কেউ হাল চাষ করে , কেউ ধান বোনে , কেউ ধান কাটে প্রভৃতি । তাৎক্ষণিক অভিনয়ের মাধ্যমে চাষ-আবাদের একটি পরিবেশ রূপায়িত হয় ।

এখানে উল্লেখের অবকাশ থাকে না যে মালদহের ' গম্ভীরা ' নৃত্য-অভিনয়ে মুখোসের ব্যাপক ব্যবহার দেখা

যায় । তুলনামূলক ভাবে পুরুলিয়া'র ' ছৌ ' নৃত্যেও মুখোসের ব্যাপক ব্যবহার বর্তমান । তবে মুখোস নৃত্য বা 'ছৌ' নাচের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর , কিন্তু মালদহের ' গম্ভীরা' লোকনৃত্যে ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে । গম্ভীরা'র বিভিন্ন প্রকার মুখোস নৃত্য সম্পর্কিত ধর্মীয় সংস্কার সম্পর্কে হরিদাস পালিত তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন ।[২] হরিদাস পালিতের প্রদত্ত বিবরণের অতিরিক্ত আরো বেশ কিছু মুখোস নৃত্য মালদহে প্রচলিত ' গম্ভীরা ' লোকায়ত নৃত্য-গীত-অভিনয়ের মধ্যে বর্তমান । সেগুলি হলো গৃধিনী বিশাল , তারকাসুর বধ , বক , ধাপা , গরুর দুধ দোয়া , কলসী কাঁখে বঁধু, মাতাল, মেমসাহেব , বুড়া-বুড়ি প্রভৃতি সামাজিক বিষয়াশ্রিত নৃত্য । এর সঙ্গে পইরী (পরী), বংশ, রণ্পা, যাদুকর, ভূত-পেত্নী প্রভৃতি মিশ্র ঘটনা কেন্দ্রিক নৃত্যও প্রচলিত ।

' আলকাপ ' মালদহের ' গম্ভীরা'রই আর একটি প্রচলিত লোকায়ত নৃত্য গীতের শাখা-অনুষ্ঠান । শিবের গাজন উপলক্ষেই আলকাপের উদ্ভব ঘটে এবং আলকাপ রীতির নৃত্য-গীত প্রচলিত হয় । প্রাচীন আলকাপে শিবের ছড়া গাওয়া অপরিহার্য্য একটি অনুষ্ঠান ছিল । কিন্তু কালের পরিবর্তনে গম্ভীরা'র সঙ্গে আলকাপের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় এবং এটি একটি স্বতন্ত্র লোকায়ত নৃত্য-গীতাভিনয়ের ধারায় পরিণত হয় ।

অষ্টদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর বঙ্গে ইংরেজ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । রাজ্যশাসন উপলক্ষে ইংরেজের গতায়াত ও বসবাস শুরু হয় । প্রায় একই সময়ে দক্ষিণ বঙ্গেও ইংরেজের আধিপত্য সমভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল । একথা সুবিদিত যে ইংরেজ নাট্যরসিক জাতি । তাই বাংলায় প্রশাসনিক কাজের অবসরে এরা নাট্যচর্চাকেই অবসর বিনোদনের সুযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয় । প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি কলকাতায় পলাশী'র যুদ্ধের চার বছর আগেই ইংরেজ একটি রঙ্গশালা স্থাপন করে । ইতিহাসে এটি 'Old play house' নামে পরিচিত (১৭৫৩ খ্রী:)। এর পরবর্তী অধ্যায়ে ইংরেজের নিজস্ব প্রচেষ্টায় কলকাতায় একের পর এক রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ঘটে । ইংরেজের এসমস্ত রঙ্গালয়ে ধনাঢ্য বাঙালী দর্শকের সবসময়ই উপস্থিতি ঘটতো — প্রথমদিকে আমন্ত্রিত উপস্থিতি , পরবর্তী পর্য্যায়ে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি । এতে ধনাঢ্য বাঙালী ব্যক্তি মানস যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয় এবং ইংরেজি মঞ্চের অনুকরণে মঞ্চ এবং মঞ্চাভিনয় করতে মনোযোগী হয়ে ওঠে ।

একদিকে ইংরেজের স্বভাব পরিবৃত সমারোহ পূর্ণ অভিনয় , অপরদিকে ইংরেজের নাট্যমঞ্চ প্রভাবিত বাঙালীর (বিত্তবান) নাট্যপ্রয়াস এবং এর সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আবৃত্তি , ইংরেজী নাটকের অভিনয় প্রভৃতি বাঙালীর মনে এক অভিনব নাট্যস্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিল । বাঙালির এই ভাবগত পরিবর্তনের আন্দোলন থেকে উত্তরবঙ্গও একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলো না । বাঙালীর নিজস্ব মৌলিক এবং অভিনয়যোগ্য নাটকের জন্য পত্র পত্রিকায় একসময় আবেদন প্রকাশিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ভদ্রার্জুন ও কীর্তি বিলাসের প্রকাশ ঘটে । এই নাটক দুটি'র একটি পৌরাণিক , অপরটি কাল্পনিক রূপকথা মূলক । এরই ফলশ্রুতিতে উত্তরবঙ্গের রঙপুর জেলার জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী সেই সময়ে নাটক নিয়ে আরো উন্নত চিন্তা ভাবনা করেন । তৎকাল প্রচলিত কৌলীন্য প্রথার দোষ দেখিয়ে নাট্যরচনা প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন — " ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে , যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব ' নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক । রংপুর পং কুন্ডী শ্রী কালী চন্দ্র রায় চৌধুরী কুন্ডী পং জমিদার।"[৮] তাঁর এই আবাহনে সাড়া দেন রামনারায়ণ তর্করত্ন । আমরা পেয়েছি ' কুলীনকুল সর্বস্ব ' নাটক (১৮৫৪ খ্রী:)।[৯] ত্রুটি বিচ্যুতি সত্বেও আমরা এই নাটকটিকে প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক বলে অভিহিত করতে পারি ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখের অবকাশ থাকেনা যে উক্ত ' শ্রী কালী চন্দ্র রায় চৌধুরী ' রঙপুরের এক অঞ্চলের ভূস্বামী। নবনাট্য আন্দোলনের ঢেউ যদি রঙপুরের বুকে সবেগে আছড়ে না পড়তো , তবে নাটক নিয়ে এমন ভাবনা চিন্তা সেখানে সম্ভব হতো না । শুধু রঙপুরই নয় , পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর , মালদহ এবং কিছু দূরবর্তী কোচবিহারেও এই নাট্য আন্দোলন অল্প বিস্তর সাড়া জাগিয়েছিল । এসব অঞ্চলের নাট্যরসিক বিদ্বজ্জন তখনকার মতো হয়তো অভিনয় যোগ্য নাটকের অভাবে ইতস্তত: যাত্রা বা কবিগানের দ্বারা তাঁদের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করেছেন , কিন্তু অভিনয়-যোগ্য বাংলা নাটক হাতে পাওয়ার পরেই তাঁরা এক মুহূর্ত্তও দেরী না করে এখানে আধুনিক রীতির মঞ্চাভিনয়ের সূচনায় ব্রতী হয়েছেন । এই রূপ প্রাণ-স্পন্দিত মঞ্চাভিনয়ের সুযোগ্য পথিকৃৎ হিসাবে স্থায়ী প্রতিষ্ঠার দাবী করতে পারে কোচবিহারে ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত খাগড়াবাড়ী গ্রামে ' খাগড়াবাড়ী ড্রামাটিক ক্লাব ' (১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ)।[১০]

সূত্রনির্দেশ

১। Sankara deva : Maheswar neog , P - 27 -- " Rama vijaya (The exploits of Rama) Written by and produced at the behests of chilaraya with the help of the latter's Nartakas or actors. "

২। ' আদ্যের গম্ভীরা ', হরিদাস পালিত , মালদহ , ১৩১৯ , পৃ: ৪৭ - ৪৯ ।

৩। ' তরাই অঞ্চলের নটুয়া ' — বীরেন রায় , পৃ: ২৯৭, মধুপর্ণী , বিশেষ দার্জিলিঙ জেলা সংখ্যা , ১৯৯৬ ।

৪। পশ্চিম দিনাজপুরের লোকনাট্য : একটি সমীক্ষা — দুলাল চৌধুরী , পৃ: ৪৪১ , মধুপর্ণী , পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা , ১৩৯৯ ।

৫। তদেব ।

৬। ' উত্তর বঙ্গের লোকনাট্য — ড: শিশির মজুমদার , ১৩৯৩ ।

৭। তদেব ।

৮। কিরাত ভূমি , বিশেষ সংখ্যা , ১৯৯৮ , পৃ: ১৯ ।

৯। ' Kulinkula Sarvasva ' , for such was the name of the play , found ready acceptance at the hands of the Bengalees, who had the satisfaction to feel that they were doing immense benefit to society by playing a drama , the soul purpose of which was to point out the glaring evils of polygamy and of that exceptional social custom known as ' Koulinya ' -- The Bengali Theatre -- S.P. Mookherjee .

১০। স্মরণিকা , কোচবিহার জেলা নাট্যোৎসব ' ৮৪ (১৯৮৪) ।